argments coincidence" ঘটানো যায় কোনও ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই। 'মাঙ্কি গড' শুনতে খেলো শোনালেও এটি কোনও ছেলেখেলা নয়, বরং রিচার্ড ক্যারিয়ারের ভাষায়, একটি সিরিয়াস রিসার্চ প্রোডাক্ট', যা 'Philo, 3:2 (Fall-Winter 2000)' জার্নালে বেশ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। আমি নিজেও ড. স্টেংগরের এই প্রোগ্রামটি তার ওয়েবসাইট থেকে বহুবার ব্যবহার করেছি। কাজেই তিনি যখন বলেন, "বর্তমান জ্ঞানে এমন কোনও ভিত্তি নেই যাতে সূক্ষ্ম সমন্বয়বাদীরা অনুমান করতে পারেন যে একমাত্র একটি সঙ্কীর্ণ, অসম্ভাব্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ প্যারামিটার ব্যতিরেকে জীবন সৃষ্টি অসম্ভব", তখন তার এই বক্তব্যকে নস্যাৎ করা যায় না।

'ফাইন টিউনিংয়ের' বক্তব্যের সমালোচনা করে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ভাইনবার্গ তাঁর 'A Designer Universe?' শিরনামে লেখা প্রবন্ধে বলেনঃ

কোনও কোনও পদার্থবিদ আছেন যারা বলেন প্রকৃতির কতিপয় ধ্রুবকের মানগুলোর এমন কিছু মানের সাথে খুব রহস্যময়ভাবে সূক্ষ্ম সমন্বয় (fine tuning) ঘটেছে যেগুলো জীবন তৈরির সম্ভাব্যতা প্রদান করে। এভাবে একজন মানব দরদী সৃষ্টিকর্তাকে কল্পনা করে বিজ্ঞানের সব রহস্যের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। আমি এ ধরনের সূক্ষ্ম সমন্বয় ধারণায় মোটেও সন্তুষ্ট নই। তিনি কার্বন তৈরির পেছনে অ্যানথ্রোপিক যুক্তির চাইতে পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাখ্যাকেই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেন।[২৩]

মনুষ্য-সৃষ্টি কেন্দ্রিক এই আপাত চমকদার অনুকল্পটি শুধু জ্যোতির্বিদ্যায় নয়, খুব উৎসাহের সাথে ইদানিং ব্যবহার হরা হচ্ছে জীববিজ্ঞানেও। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, জীববিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা যেভাবে যুক্তি সাজিয়ে থাকেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ফাইন টিউনাররা দেন ঠিক উল্টো যুক্তি। জীববিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা বলেন আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই অনুপযুক্ত যে প্রাকৃতিক নিয়মে এখানে এমনি এমনি প্রাণের সৃষ্টি হতে পারে না। আবার জ্যোতির্বিজ্ঞানের ফাইন টিউনাররা ঠিক এর বিপরীত কথা বলেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাণ-সৃষ্টির পক্ষে এতটাই উপযুক্ত যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃতিক নিয়মে কোনওভাবেই সৃষ্ট হতে পারে না। একই সাথে দুই বিপরীত মেরুর কথা তো সত্য হতে পারে না। মাইকেল আইকেদা, বিল জেফ্রিস, ভিক্টর স্টেংগর, রিচার্ড ডকিন্সসহ অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে ফাইন টিউনিং বা অ্যানথ্রোপিক যুক্তিগুলো আসলে সেই পুরান 'গড ইন গ্যাপসের' যুক্তিবাদেরই নব্য সংস্করণ। যেখানে রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, সেখানেই ঈশ্বরকে টেনে আনা হচ্ছে। এভাবে মুক্তবুদ্ধি ও বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত না করে বরং অন্ধ বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করা হচ্ছে। এ কারণেই রিচার্ড ডকিন্স তাঁর The "know-nothings", the "know-alls", and the "no-contests প্রবন্ধে[২৪] বলেন,

সারল্য (সহজ) থেকে কীভাবে জটিলতার (কঠিন) উদ্ভব ঘটে তার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান আমাদের কাছে হাজির করে। কিন্তু 'ঈশ্বরের অনুকল্প' (hypothesis of God) কোনও কিছুর জন্যেই গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারে না, কারণ আমরা যা কিছুর ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করি এই অনুকল্প তা স্বীকার করে নেয়।

বস্তুত অনেক বিজ্ঞানীই আজ মনে করেন যে, মহাবিশ্ব মোটেই আমাদের জন্য 'ফাইন-টিউন্ড' নয়, বরং আমরাই মহাবিশ্বে টিকে থাকার সংগ্রামে ধীরে ধীরে নিজেদেরকে ফাইন-টিউন্ড করে গড়ে নিয়েছি। অর্থাৎ সহজ কথায়, - "মহাবিশ্ব মনুষ্যত্বের জন্য সূক্ষ্মভাবে সুসমন্বিত নয়, বরং মনুষ্যত্বই মহাবিশ্বের সাথে সূক্ষ্মভাবে সুসমন্বিত" (The universe is not fine-tuned for humanity; Humanity is fine-tuned to the Universe)। ব্যাপারটা হয়ত মিথ্যে নয়। আমাদের চোখের কথাই ধরা যাক। মানুষের চোখ বিবর্তিত হয়েছে এমনভাবে যে, এটি লাল থেকে বেগুনী পর্যন্ত সীমার তাড়িতচৌম্বক বর্ণালীতে কেবল সংবেদনশীল। এর কারণ হলো আমাদের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে এই সীমার আলোই বছরের পর বছর ধরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছছে। কাজেই সেই অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে সে ভাবেই বিবর্তিত হয়েছে। পুরো ব্যাপারটিকে আবার অন্য কেউ উল্টোভাবেও ব্যাখ্যা করতে চাইতে পারেন। যেমন তিনি বলতে পারেন যে ঈশ্বর আমাদের চোখকে লোল-বেগুনী সীমায় সংবেদনশীল করে তৈরি করবেন বলেই বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে এই পরিসরের অর্থাৎ লাল থেকে বেগুনী আলো আমাদের চোখে প্রবেশ করতে দেন। তাই আমাদের চোখ এরকম। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যাকরণ কতটা যৌক্তিক? এরপরও সূক্ষ্ম সমন্বয়কারীরা ঠিক এ ধরনের যুক্তি দিতেই পছন্দ করেন। মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলো কেন এ ধরনের মান গ্রহণ করল এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না খুঁজে, - তা 'না হলে পরে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি আর মানুষের আবির্ভাব ঘটত না' এ ধরনের যুক্তি উত্থাপন করে থাকেন।

প্রাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মুখ্য হয়, তবে বিগ-ব্যাংয়ের পর ঈশ্বর কেন ৭০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন এই পৃথিবী তৈরি করতে, আর ৬০০ কোটি বছর কাটিয়েছিলেন পৃথিবীতে 'মানুষের অভ্যুদয়' ঘটাতে। এর কি কোনও যৌক্তিক ব্যাখ্যা মেলে? পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস-পরিক্রমায় আমরা তো আজ জানি যে মানুষ পুরো সময়ের মাত্র একশ ভাগেরও কম ভাগ ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। তারপরও মানুষকে এত বড় করে তুলে ধরে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন?

আসলে 'ঈশ্বর নির্ধারিত মানবকেন্দ্রিক' সংস্কারের ভূত মনে হয় কারো কারো মাথা থেকে যাচ্ছে না। সেই টলেমীর সময় থেকেই আমরা তা দেখে আসছি। আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীটি কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সাধারণ একটি গ্রহ মাত্র- এটি না সৌর জগতের, না মহাবিশ্বের কেন্দ্র। আসলে মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলে কিছু নেই। আর এ সত্যটি গ্রহণ করতে আমাদের লেগেছে দীর্ঘ সময়। ভূকেন্দ্রিক মডেলের স্থানে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞান সাধনাই যথেষ্ট ছিল না, এর জন্য কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও প্রমুখ মুক্তচিন্তার মানুষকে সইতে হয়েছে নির্যাতন। একই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে উনবিংশ শতাব্দীতে যখন চার্লস ডারুইন (১৮৫৯) এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস প্রাকৃতিক নির্বাচনের (natural selection) মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বিবর্তনের ধারণা সাধারণ মানুষ এখনও মন থেকে মেনে নিতে পারে নি, কারণ এ তত্ত্ব গ্রহণ করলে 'ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত' বিশেষ সৃষ্টি মানুষের বিশিষ্টতা ক্ষুণ্ন হয়। আর এ কারণেই মানুষ আজও নিজেকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ভেবে নিজেকে সৃষ্টির মধ্যমণি করে, পৃথবীকে মহাবিশ্বের মাঝে বসিয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। ফাইন টিউনিং ও অ্যানথ্রোপিক যুক্তিগুলো এ জন্যই মানুষের কাছে এখনও এত আকর্ষণীয়।

সত্যি বলতে কি মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে 'ঈশ্বরের অস্তিত্বের' প্রয়োজন একটি বিশ্বাস-নির্ভর ধারণা মাত্র, এটিকে কোনও দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা তত্ত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ধর্মপ্রাণ মানুষের অন্তরের অনুভূতি ও বিশ্বাসই এর আসল ভিত্তি।

অনেক বিজ্ঞানীই ব্যক্তিগতভাবে ধর্মভীরু হতে পারেন, কিন্তু তারা এই বিশ্বাসকে ব্যক্তিগত পরিধিতেই সীমাবদ্ধ রাখেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে জড়িয়ে ফেলেন না। তারা নিরাসক্তভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাফল্যজনক প্রয়োগের মধ্য দিয়েই মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং বহু ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হচ্ছেন। এভাবেই ধাপে ধাপে বিজ্ঞানীরা এগুচ্ছেন। তারপরেও এটি স্বীকার করতে হয় যে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে অনেক জায়গাতে এখনও 'ফাঁক' বা অপূর্ণতা রয়ে গেছে; অসমাধিত রয়ে গেছে অনেক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। যেমন, আমরা এখনও জানি না পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো কীভাবে এক সময় তৈরি হলো, আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি সৃষ্টির সূচনায় প্রকৃতি কেন প্রতি-কণিকার তুলনায় পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিল কণিকাদের প্রতি, কৃষ্ণ গহ্বরের কেন্দ্রেই বা কি রয়েছে, কেনই বা মহাবিশ্ব ত্বরিত হচ্ছে, আমাদের মহাবিশ্বের মতো কি আরো অসংখ্য মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে ? বিগ-ব্যাংয়ের পূর্বে স্থান বা কালের কি কোনও